পাখি ও যৌবন

রাহাত খান

(এক)

ছুটির দিন। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সেদিনকার খবরের কাগজ পড়ছেন সেলিম হক। সকাল থেকে এ পর্যন্ত বেশ ক'বার কাগজটা তার পড়া হয়েছে। পড়া মানে কাগজটা নিয়ে বসা, উল্টেপাল্টে দেখা। সময় কাটানো।

এ একটা বিতিকিচ্ছিরি নেশা বটে। সব পড়া হয়ে গেলেও কিংবা পড়তে ইচ্ছে না করলেও কীসের টানে যেন কাগজটা নিয়ে বসতে হয়। আবার শিরোনামগুলো ঘাঁটতে হয়। পড়তে হয়। ক্লান্তি আসে। হাই উঠে, তবু! দিবানিদ্রা দিয়ে ওঠে সন্ধ্যার মুখে আবার হয়তো কাগজটা নিয়ে বসবেন সেলিম হক।

ইদানীং ছুটির দিনে তার কোথাও যাওয়াটাওয়া হয় না। ঘুরতে যাওয়া, বাইরে খেতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সব বাদ দিয়েছেন। ছুটির দিনে বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকেন তিনি। বাইরে গেলেও রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ একা একা ঘোরা। ব্যস, বাইরে যাওয়া বলতে এইটুকু। বেশির ভাগ সময় ঘরেই থাকা হয়। অফিস বা তেমন কোনো কাজ না থাকলে তার ব্যাপারটা দাঁড়ায় ঘরে বসে কোনোরকমে সময়টা কাটানো।

কোনোরকমে সময় কাটানো ছাড়া আর কী! যেমন আজ ছুটির দিনে যা যা করেছেন। প্রাতঃক্রিয়াদি, নাশতা করা এসব তো আছেই। এছাড়া ছিল খবরের কাগজ পড়া। ব্যালকনি ধরে আকাশ ও মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকা। খাঁচায় ঝুলানো আছে এতোদিনে বন্দিত্ব ও নিরিবিলি সুখ মেনে নেওয়া একটা লাল ঠোঁট, সবুজে হলুদে মেশামেশি শরীরের টিয়া পাখি। সেলিম হক বেশ কিছুক্ষণ টিয়া পাখিটার সাথে কথা বলেছেন। শোবার ঘরে এসে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন ছোট মেয়ে রুমানার সাথে। খামোখা চুপচাপ কিছুক্ষণ

শুয়েও ছিলেন বিছানায়। এই তো ছুটির দিনে তার সময় কাটানো।

তার বেকার সময় কাটাবার একটা শিথিল ছকও আছে। এই

যেমন বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কাগজ পড়াটা হচ্ছে এক হিসেবে

সাড়ে বারোটা বাজার অপেক্ষা করা। সাড়ে বারোটা বাজা মাত্র

কাগজ পড়া ছেড়ে তিনি ঢুকবেন বাথরুমে গোসল করতে। তার কাজের মহিলাটা এ্যাতোদিনে তার অভ্যাসগুলো, তার ধরনগুলো, কখন কী করবেন-ধরবেন ইত্যাদি বেশ বুঝে গেছে। সেলিম হক বাথরুমে গোসল করতে ঢোকা মাত্র সে খাওয়ার স্পেসে রাখা ছোট টেবিলে খানা সাজিয়ে রেখে দেবে। একেবারে টিপটপ সবকিছু। সেলিম হক সোয়া একটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে বসবেন টেলিভিশনের সামনে। আগে ওঠা-বসার ঘরে ছিল, কিছুদিন হয় শোবার ঘরে নিয়ে এসেছেন সেলিম হক।

টেলিভিশন খুব একটা যে তিনি দ্যাখেন তা নয়। টেলিভিশনের পর্দায় নারীশরীর, নাচ-গান, প্রেম, চোখের পানি ফেলা, মিলন, বিরহ ইত্যাদি দেখতে আজকাল তার ভালো লাগে না। কিংবা হয়তো ভালো লাগে। কোনো কোনো নারী শরীর দেখে কিংবা প্রেম ও মিলনের দৃশ্য দেখে তার নিজের সেই কিছুকালের উদ্দাম যৌবনের কথা হয়তো মনে পড়ে। মনে পড়ে স্ত্রী রায়হানার কথা। রিমোট টিপে তখন অন্য চ্যানেলে চলে যান সেলিম হক। এক রকমের অন্যমনস্কতা তাকে তখন গ্রাস করে ফেলে। ভাবেন, তিনি তো স্বেচ্ছাবন্দি, তার এসব দেখে কী হবে? ছুটির দিনে হোক, রাতে শোয়ার আগে হোক, টেলিভিশনে খেলাধুলা, আলোচনা প্রোগ্রাম কিংবা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রোগ্রাম ছাড়া বিশেষ কিছু তিনি দ্যাখেন না। তার মনে কার বা কাদের ওপর যেন ভালো করে না-জানা একটা অভিমান আছে। তিনি ভাবেন, ওসব দেখে তার কী হবে! তার তো হচ্ছে কোনো রকমে সময় কাটানো।

চিৎ হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন সেলিম হক, আসলে অপেক্ষা করছেন সাড়ে বারোটা বাজার। এই সময় সামান্য একটু দূরে, ড্রেসিং টেবিলের পাশে ছোট টেবিলে রাখা টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। কাগজ ফেলে তখনি তিনি উঠে বসেন। তার নিয়মিত ফোন তিনটা। ছোট মেয়ে রুমানা। অফিসের বন্ধু ও সহকর্মী হাসান আহমদ এবং চট্টগ্রামে

থাকা ছোট ভাই হারুন। হারুনের ফোনই হবে ভেবে রিসিভার তুলে সেলিম হক একটু উদগ্রীব হয়ে বলেন ঃ হ্যালো।
নারী কণ্ঠে খুব মোলায়েমভাবে কেউ বলে ঃ স্লামালাইকুম স্যার...সেলিম হক তক্ষুণি বুঝতে পারেন। তবাস্সুম। পাশের গলিতে থাকে। ভাইয়ের আশ্রিতা। মহিলার চোখ দুটি ভারী সুন্দর।
তিনি কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে বরং খানিকটা বিরস কণ্ঠে বলেন ঃ ওয়ালাইকুম সালাম...
ঃ ভালো আছেন স্যার?
ঃ জি ভালো আছি। আপনারা ভালো?
এসব নেহায়েতই ভদ্রতা করে বলা। সেলিম হক কথা বলছিলেন আর ভাবছিলেন ঐদিনের ঘটনার পর তবাস্সুমের তো ফোন করা উচিত ছিল না। আবার কেন তার সেলিম হককে ফোন করা?
তবাস্সুম বলে ঃ স্যার খুব ব্যস্ত আছেন না তো?
ঃ তেমন কিছু না। বলেন...
ঃ ভাবী সাহেবা বলতে ছিলেন কি...
ঃ কী বলতে ছিলেন?
তবাস্সুম কুণ্ঠিত স্বরে বলে ঃ আপনি গোসা করছেন না তো?
ঃ না। আপনি বলেন...
ঃ ভাবী সাহেবা একদিন আপনাকে মেহেরবানি করে আসতে বলছে। যদি তশরিফ আনেন..
ঃ কবে?
ঃ আপনার যখন সময় হবে...
এই কথার জবাব না দিয়ে সেলিম হক তবাস্সুমকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার ভাইয়ের বদলির অর্ডার কি হইছে?
ঃ জি না। এখনো হয় নাই।
ঃ ফরিদপুরেই আছেন?
ঃ জি!
ঃ তো আপনারা ফরিদপুরে চইলা গেলেই তো পারেন...
তবাস্সুম বলে ঃ ভাবী সাহেবার বাপের বাড়ি পুরান ঢাকায়। তিনি যাইতে চান না...
এসব গল্প হতে থাকে তবাস্সুমের সাথে সেলিম হকের। একটু মুটিয়ে গিয়ে তবাস্সুম তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কিছুটা খুইয়ে বসেছে। দুঃখিনী দুঃখিনী ভাবটাও তাকে অন্তত সেলিম হকের কাছে কিছুটা অনাকর্ষণীয় করে তোলে। তা নইলে মহিলার বয়স এমন কিছু না, চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি তো নয়-ই। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। নন-বেঙ্গলি অরিজিন বলেই হয়তো। আর তবাস্সুমের চোখ দুটি, তুলনা হয় না, ভারী সুন্দর।
তবে সে যা-ই হোক। বিষয়টা হচ্ছে ঃ তবাস্সুমকে বিয়ে করা। তবাস্সুমের ভাই, ভাবী এবং তবাস্সুম নিজেও হয়তো সেটাই চায়। সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন সেলিম হক। কায়সারুল আমিন, তবাস্সুমের ভাই সেদিন বাসায় ছিলেন না। সেলিম হক গিয়ে খুব গল্পসল্প করেছিলেন ভাবী সাহেবা এবং তবাস্সমের সাথে। গল্পসল্প করা তার ঠিক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন তার পক্ষে তবাস্সুমকে বিয়ে করা যে সম্ভব নয় সেটা খুব পরিষ্কার করে জানাতে। গল্পসল্প করার ফাঁকে সেটা সেলিম হক সেদিন ভাবী-সাহেবা এবং তবাস্সুমকে বলেও এসেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এরপর হয়তো তবাস্সুম কিংবা ওর ভাবী লালা বেগম তার আর কোনো খোঁজখবর করবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তবাস্সুম ও তার ভাই-ভাবীর উৎসাহ এখনো আছে।
তবাস্সুমের সাথে ফোনে কথা বলতে সেলিম হকের মন্দ লাগছিল না। অফিস, কাজ বোরডম ও ঘুমোনো ছাড়া ইদানীং আর কোনো ঘটনা তো ঘটছে না। ইদানীং সময় সময় খারাপ লাগতে থাকে খুব। ক্রমাগত খারাপ লাগতে থাকাটা পরে দিন-রাতের পুরো সময়টাকে নিয়ে একটা মন-খারাপের মিহি কুয়াশায় ডুবে যায়। এ সবই তার জীবন। এভাবে তার সময় কাটে। এর মধ্যে তবাস্সুমের ফোন যেন আলাদা কিছু একটা ঘটনা। কিছুক্ষণের সময়টা বেশ আলোকিত হয়ে উঠে যেন। তবাস্সুমের সাথে কথা বলতে বলতে ভালো লাগছিল সেলিম হকের। স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল নিজেকে। তবে কোনো প্রশ্রয়ও দিতে চাচ্ছিলেন না মহিলাকে। তার তো সত্যি বিয়ে করার উপায় নেই। তাহলে খামোখা কাউকে আশা-ভরসা দেওয়া কেন?

কথা বলতে ভালো লাগছিল সেলিম হকের। আবার কথা বলছিলেন কিছুটা সতর্ক হয়ে। বিয়ের ফাঁদে পা দেওয়ার ইচ্ছে বা উপায় কোনোটাই তার নেই। বাকি জীবনটা তাকে আপনা-আপনি তৈরি হওয়া বন্দিত্বের মধ্যেই কাটাতে হবে। তবাস্‌সুম বলে ঃ আপনার চিড়িয়া কেমন আছে স্যার?

ঃ ভালো।

ঃ কথাটথা কিছু বলে?

ঃ হ্যাঁ। মাঝে মাঝে খুব চিল্লায়।

ডাকাডাকি করে!

তবাস্‌সুম একটু হাসে। বলে ঃ ফির ওকে আটকে রাখছেন ক্যান স্যার? আমি হলে ওকে ছেড়ে দিতাম...

সেলিম হক এই কথার কোনো উত্তর দেন না। টিয়াপাখিটা দিব্যি তো আছে ব্যালকনিতে ঝুলানো তার খাঁচায়। মুক্ত বাতাসে উড়তে না পারার জন্য নিশ্চয়ই তার কষ্ট হয়। তবে কষ্ট হতে হতে এক সময় সেটা সহ্যও তো হয়ে যায়। পাখিটা নিশ্চয়ই এতোদিনে সব সয়ে নিতে পেরেছে। খাঁচার দাঁড়ে তার বসে থাকা, কিংবা দানাপানি খেতে দেওয়ার সময় তার হুড়োহুড়ি, নাচানাচি দেখে মনে তো হয় না সে খুব কষ্টে আছে।

সেলিম হক বলেন ঃ পাখিটা আপনি নিবেন?

তবাস্‌সুম আগ্রহে প্রায় ফেটে পড়ে বলে ঃ আপনি দিবেন?

ঃ হ্যাঁ। দিব না কেন? নিতে চাইলে দিব!

তবাস্‌সুম কী যেন বলতে চেয়ে হঠাৎ থেমে যায়। বলে ঃ কিন্তু লালা ভাবী যে চিড়িয়া পছন্দ করে না!

ঃ করে না?

ঃ না। একদম করে না। ভাবীজির খালি পছন্দ ঘর-সংসার করা। আমার তো ঘর-সংসার কিচ্ছু নাই। আপনার চিড়িয়া আমি রাখব কোথায়?

ঘর-সংসার নিয়ে তবাস্‌সুমের দুঃখ থাকা স্বাভাবিক। দুদুবার তার বিয়ে হয়েছিল। প্রথম স্বামী তবাস্‌সুমকে নিয়ে সৈয়দপুরে থাকত। বিয়ের দুবছর যেতে না যেতেই সে মোটর এক্সিডেন্টে মারা যায়। এরপর বেশ ক'বছরের বিরতি। দ্বিতীয়বার তবাস্‌সুমের বিয়ে হয়, বছর চারেক আগে, পুরোনো ঢাকার এক ব্যবসায়ীর সাথে। লোকটা বাইরে বাইরে খুব ভালো ছিল। দেখতেও বেশ জোয়ান মর্দ। তবাস্‌সুমের সাথে মানিয়েছিল বেশ। কিন্তু বিয়ের পর দফায় দফায় সে যৌতুকের টাকা চাইত তবাস্‌সুম এবং তার ভাই কায়সারুল আমিনের কাছে। টাকা না পেলে মেরে প্রায় লাশ বানিয়ে তবাস্‌সুমকে ভাইয়ের বাসায় পাঠিয়ে দিত। লোকটার কাছ থেকে তালাক চেয়েও পাচ্ছিল না তবাস্‌সুম। শেষে লালা ভাবী পুরান ঢাকার সর্দার ও গুণ্ডা মাস্তানদের ধরাধরি করে অতি কষ্টে লোকটার কাছ থেকে তবাস্‌মুমের তালাকের ব্যবস্থা করে। এসবই সেলিম হক জানেন। তবাস্‌সুমের দুদুবার বিয়ে হয়েও ঘর সংসার করতে না পারার দুঃখটাও তার অজানা নয়।

দুজন মিলে কথাবার্তা হতে থাকে। ফোনে মাঝে মাঝে তবাস্‌সুমের সাথে সেলিম হকের এ ধরনের কথাবার্তা হয়। তবাস্‌সুম হয়তো কখনো একটু উছলে ওঠে, দেয়ালটা ডিঙাতে চায়। কিন্তু সেলিম হক চান না। তবাস্‌সুমের সাথে ফোনে কথা বলার সময় তিনি জানেন কত দূর গেলে কোনো ক্ষতি নেই এবং কখন শেষ করতে হয়।

একথা ওকথার পর তবাস্‌সুম বলে ঃ কবে আসছেন স্যার?

ঃ কোথায়?

ঃ কেন আমাদের বাসায়?

ঃ ঠিক আছে, দেখি।

এইটুকু বলে অস্ফুটে খোদা হাফেজ জানিয়ে ফোন রেখে দেন সেলিম হক।

তার এই মহিলাটিকে বিয়ে করতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি জানেন তবাস্‌সুম খুব দুঃখিনী মহিলা। দু'দুবার বিয়ে হয়েও সে সংসার করতে পারেনি। সে একটা সংসার চায়। সেলিম হক একবার সংসার করেছিলেন। তখন তার রুজি-রোজগার কম ছিল, খুবই কষ্ট করে চলতে হত তাদের। মাঝে মাঝে সংসারকে তার বোঝা বলে মনে হত। তার স্ত্রী রায়হ-ানার এক ধরনের খাপ্পা মেজাজ ছিল, চটে উঠ্‌ত সামান্য কিছুতেই, কথা কাটাকাটি লেগে যেত, এক সময় চুপ করে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না সেলিম হকের। চড়া মেজাজের স্ত্রীটিকে তিনি বরাবর সমঝে চলতেন।

আবার এই রায়হানারই

ছিল অল্প কিছুতে খুশি হয়ে ওঠার স্বভাব। কালো, পাতলা শরীর, গোল স্তন, মাথার গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়ানো চুলের মহিলাটি মাঝে
মাঝে সেলিমকে তাদের দু'জনের একান্ত সময়ে এ্যাতো দিতে
জানত, অ্যাতো ভালোবাসতে পারত! আজকাল তার মনে হয় তার
ও রায়হানার ভালোবাসার সংসারই ছিল। বড় আফসোস হয়, ১৬ বছরের সংসার ফেলে রেখে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ক্যান্সারে ভুগে
মারা গেল রায়হানা। রায়হানার জন্য সেলিম হকের আফসোস
যেন ফুরাতে চায় না।

রায়হানাকে তিনি আজও ভালোবাসেন। এই ভালোবাসা কোনোদিন ফুরোবার নয়। তবে এরপরও তো মানুষের জীবনের গল্পটা শেষ হয়ে যায় না। মানুষের মন ও দেহ বলে কথা, তারা আরো চায়, প্রতিনিয়ত চায়। সেলিম হকের মনে হয়েছে আবার সংসার করলে কেমন হয়? সংসার মানে তো মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের রচনা। একটা আশ্রয়। তবাস্সুমকে বিয়ে করতে তারও কোনো আপত্তি ছিল না।

তার দুই মেয়ে সুমনা ও রুমানা। রায়হানার মৃত্যুর সময় সুমনার বয়স ছিল ১৪ এবং রুমানার ১১ বছর। শ্বশুরবাড়ির দিকে তার শাশুড়ি এবং বাপের বাড়ির দিকে এক ভাই ছাড়া সেলিম হকের তত্ত্বতালাশ নেওয়ার মতো কেউ ছিল না। মা হারা মেয়ে দু'টি কার কাছে কোনো অভিযোগ করত না, তারা স্কুলে যেত, বাপের জন্য রান্না করে রাখত, ঘর-দুয়োর গোছাত। এভাবে তারা একটা মা-হারা বাড়িতে বড় হয়ে উঠছিল। সেলিম হক যতটা সম্ভব তার মেয়েদের মা ও বাবা হয়ে উঠেছিলেন। নিজের কথা আদৌ ভাবতে চাইতেন না তিনি।

রুমানার বিয়ে হয়েছে গত বছরের আগের বছর। তার আগেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। তবে সেটা কেউ জানত না। তার বন্ধু ও সহকর্মী হাসান আহমদ হয়তো কিছুটা জানতেন। তাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিয়ে নিয়ে ম্যালা কথাবার্তাও হত। বিয়ে নিয়ে মানে সেলিম হকের বিয়ে নিয়ে। হাসান আহমদ বলতেন ফালগুনী'কে বিয়ে করে ফেলতে। ফালগুনী ছিল তাদের অফিসেরই কম্পিউটার অপারেটর। বছর চারেক আগে বিধবা হয়েছে, বেশ হাসিখুশি, চলাফেরায় স্মার্ট মহিলা।

সেলিম হক বরাবর 'না, না' করেছেন। বিয়ে করতে চান এটা বন্ধু হাসান আহমদের কাছে স্বীকার যাননি তিনি। যদিও মনে মনে ভাবতেন। ফালগুনীকে নয়। তবাস্সুমকে বিয়ে করলে কেমন হয় এটা ভাবতেন তিনি। তবাস্সুমের ভাই কায়সারুল আমিন কিছুদিন ব্যাঙ্কের চাকরি করেছিলেন। সেটা অবশ্য বহু বছর আগে। তারপর আমিন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যোগ দেন সরকারি চাকুরিতে। বছর তিনেক আগে বারো তলা এপার্টমেন্ট ভবনের দশ তলায় দুই রুমের ফ্ল্যাট কিনে রাজাবাজারে থিতু হলে বহু বছর পর আবার একদিন রাস্তায় দেখা হয় কায়সারুল আমিনের সাথে। কায়সার সাহেব একদিন সেলিম হককে তার বাসায়ও নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী স্ত্রী এবং তবাস্সুম মিলে সেলিম হকের ফ্ল্যাটেও দিন দুই এসেছেন ওরা। তবাস্সুম খুব দুঃখিনী মহিলা। দু'দুবার বিয়ে হয়েও সে সংসার পায়নি। তার টানা টানা, সুন্দর চোখ দুটিতে মাঝে মাঝে যেন সংসারের সেই স্বপ্ন-সাধই ভাষাময় হয়ে ফুটে ওঠে। সেলিম হক বরাবরই ভাবতেন, তবাস্সুমকে বিয়ে করলে কেমন হয়? তখন তার ছোট মেয়ে রুমানারও বিয়ে হয়ে গেছে।

সেলিম হক এখন আর বিয়ের কথা ভাবেন না। মেয়ে দু'টিকে অসুখী করে, ওদের কাঁদিয়ে, দুঃখ দিয়ে এ বয়সে বিয়ে করার ইচ্ছে তার নেই। ৫৪ বছর বয়েসটা বিয়ে করে নতুনভাবে জীবন শুরুর জন্য একটু বিপজ্জনকও বটে। ধরা যাক, বিয়ে করার পর তার দ্বিতীয় স্ত্রী পুত্র বা কন্যা সন্তান উপহার দিতে শুরু করল তখন? ৫৪ বছর বয়সটা নতুনভাবে জীবন শুরুর জন্য বিপজ্জনক। তবে ৫৪ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা বা ক্ষমতা তো হারায় না। ঐ বয়সে সন্তান হওয়ার বিপদ সেলিম হক বিলক্ষণ জানেন। তার এক চাচা ৫৯ বছর বয়সে দ্বিতীয় সংসার করে দু'বছরের এক ছেলে এবং চার বছরের এক মেয়েকে রেখে মারা যান বিয়ের ৬ বছর পর। বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে এরপর তার স্ত্রী'র কী দশা হয়েছিল তা জানা আছে সেলিম হকের।

সেলিম হক মারা গেলে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় অ্যাতোটা দুর্দশা নাও হতে পারে হয়তো। কেননা রাজাবাজারে তার দুই

রুমের ফ্ল্যাটটা ছাড়াও সাভারে একেবারে রাস্তার ধারে তার বেশ মূল্যবান পাঁচ বিঘা পরিমাণের একটা জমি আছে। ব্যাংকে কিছু টাকা পয়সাও আছে তার। তিনি মারা গেলে তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তাদের সন্তান নিশ্চয়ই সেই সম্পত্তি এবং টাকা থেকে বঞ্চিত হত না। অন্তত মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই এবং দু'বেলা ডাল-ভাত খাওয়ার একটা সংস্থান তাদের হয়েই যেত।
তবে কথা সেটা নয়। কথা হচ্ছে তার মেয়েদের নিয়ে। সুমনা ও রুমানা। রায়হানা মারা যাওয়ার পর সেলিম হক একই সাথে যথাসম্ভব মা ও বাবা হয়ে তাদের পেলেপুষে বড় করেছিলেন। দুই মেয়েকে অসুখী করে, তাদের কাঁদিয়ে, দুঃখ দিয়ে দ্বিতীয়বার ঘর-সংসার করার কোনো ইচ্ছে সেলিম হকের নেই।
সেলিম হকের দ্বিতীয় সংসার হলে মেয়ে দু'টি কি খুব দুঃখ পাবে? হ্যাঁ, পাবে। দুঃখ পাবে তারা। সর্বক্ষণ চোখের পানি মুছতে থাকবে।
সুমনা ও রুমানা দু'জনই চায় বটে তাদের বাবা আবার বিয়ে করে সংসারী হোক। বিয়ে হওয়ার পরপর সুমনা খুব বলত, এখন বিয়ে হয়ে গিয়ে রুমানাও বলে। দুই বোনই তারা মুখে বলে তাদের বাবা বিয়ে করুক। বলে, তারা আবার লুকিয়ে কাঁদে। হয়তো মায়ের কথা মনে পড়ে তাদের। কাঁদে চুপিচুপি। কিন্তু বাপের কাছে সন্তানের কান্না কি লুকানো থাকে? সেলিম হক ঠিকই দেখেছেন কীভাবে তারা বাপকে হাসিখুশি হয়ে বলে তাদেরকে একটা নতুন মা এনে দিতে আবার কীভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। মেয়েদের কাঙাল, দুঃখী চেহারা এবং কান্নায় লাল হয়ে-ওঠা চোখ দেখে বুক ভেঙে যায় সেলিম হকের। বুঝতে পারেন মা-বাবা বলতে তিনি ছাড়া সুমনা ও রুমানার তো কেউ নেই। রায়হানা মরে যাওয়ায় ওরা মা হারিয়েছিল। এবার সেলিম হক বিয়ে করলে বাবা হারাবে বলেও মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে ওরা।
শুধু সুমনা-রুমানার কষ্ট নয়, কষ্ট তিনিও কম পাচ্ছিলেন না। বিয়ের চিন্তা সেই থেকে ত্যাগ করেছেন। কাচের পাত্র ভেঙে গেলে জোড়া দেওয়া যায় না। তার ভাঙা সংসারও বিয়ে করে আর জোড়া দেওয়া যাবে না। তারচেয়ে মেয়ে দু'টি বাবার মধ্যে মা ও বাবা দু'জনকে পায়। সে-ই বরং ভালো। সুমনা, রুমানাই সুখী থাক। বাচ্চাদের সুখেই তার সুখ।
সেলিম হকের এখন হচ্ছে সময় কাটানো। এই ক'বছরের মধ্যেই তার একটা চুপচাপ গম্ভীর স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। অফিস ও বাসা। - এই ছকের বাইরে যেতে ইদানীং তার ইচ্ছে করে না। সুমনার বাচ্চা আসছে আগামী আগস্টে। তার মানে খুব শিগগির তিনি নানা হতে যাচ্ছেন। তারপর একদিন রুমারাও বাচ্চা হবে নিশ্চয়। সেলিম হক পেয়ে যাবেন তার দুই মেয়ের কাছে দুটি স্বর্গ। রিটায়ারমেন্ট হয়ে গিয়ে সেলিম হকের জীবন তখন হবে বছরের একেকটা সময় একেক মেয়ের কাছে গিয়ে থাকা। এছাড়া মেয়েরাও আসবে যাবে তার রাজারবাগের ফ্ল্যাটে। সময় কাটাতে কোনো অসুবিধেই হবে না সেলিম হকের অফুরন্ত সুযোগ তার আসছে সময় কাটাবার।
তবাস্সুমের সাথে ফোনে কতক্ষণ কথা বলা হল? ঘড়িতে সময় দ্যাখেন সেলিম হক। তবাস্সুম ও তিনি ফোনে চৌদ্দ মিনিটের বেশি কথা বলেছেন। তাতে গোসল করতে যেতে একটু দেরি হল বটে। তবে ছুটির দিন। সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলেও ক্ষতি নেই। সেলিম হক গোসল ও খাওয়া সেরে যথারীতি টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসেন। প্রথমে চ্যানেল ঘুরিয়ে খেলা খোঁজেন। হঠাৎ একবার টেলিভিশনের পর্দায় নর্তকীর পোশাকে মাধুরী দীক্ষিতকে একঝলক দেখা গেল। দেখতে চাইলেন না। চ্যানেল ঘুরিয়ে খেলা খুঁজতে থাকেন। তার এখনো খুব প্রিয় সুচিত্রা সেন, মধুবালা ও মাধুরী দীক্ষিতের মুখ। এমনকি শরীর। এরা সবাই অ-ধরা। শুধু ছোট বা বড় পর্দায়ই ওরা সেলিম হকের মতো লোকদের কাছে ধরা দেয়। কিন্তু সেই সুযোগও আজকাল নিতে চান না সেলিম হক। কোথাও কার বা কাদের প্রতি যেন ব্যাখ্যা-না-জানা একটা অভিমান আছে তার। যা-কিছু শরীরের ও যৌবনের এবং যা-কিছু সুন্দরের তা তিনি ভয়ে ও অভিমানে এড়িয়ে চলেন।
টেনিসের একটা পুরোনো খেলা ছিল। সেটা কিছুক্ষণ দেখতে না দেখতে তার চোখে তন্দ্রা মতো এসে যায়। বিছানায় গিয়ে সুখে ও আরামে লম্বা হলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠে দক্ষিণের ব্যালকনিতে গিয়ে বসেন। যেখানে ঝুলানো খাঁচায় বন্দিত্ব সয়ে নেওয়া টিয়া-পাখিটা আছে। তখনো বাইরে উঁচু ভবন ও গাছপালার ওপর শেষ বিকেলের কিছু রোদ ছিল। ব্যালকনিতে বসে থাকতে থাকতে রোদটুকু মুছে গেল। ঘনায়মান অন্ধকারে আকাশে কয়েকটা তারা ফুটল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন সেলিম হক। বাইরে তার বেরোতে ইচ্ছে করে না ইদানীং। তিনি জানেন রাতের শহর সক্রিয়, আমুদে এবং জীবনবাদী মানুষের জন্য সুন্দরভাবে তৈরি আছে। বাইরে গেলে সময়টা সুন্দরভাবেই কাটতে পারত। কিন্তু ইদানীং তার তেমন বেরোতে ইচ্ছে করে না। যদিও জানেন এভাবে জীবন থেকে দূরে দূরে থাকাটা, এভাবে দিনগুলো ও রাতগুলো

কাটানো অর্থহীন, একেবারেই অর্থহীন। কিন্তু তা হোক, সময়টা কোনো রকমে গেলেই তার হয়।

(দুই)

[সেলিম হকের নিজের জবানীতে]

বেশ কিছুদিন পরের কথা। শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে বিকেলের দিকটায় বাসায় চলে এসেছিলাম। বাসায় ফিরে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে, আর কিছু না হোক, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। এও বুঝতে পারছিলাম, হেমন্ত গিয়ে শীত আসছে, ঋতু-বদলের সময় অনেকের সর্দিজ্বর-টর ধরনের কিছু একটা যা হয় আমারও হয়তো সে রকমেরই কিছু একটা হবে।

দাঁড়িয়েছিলাম দক্ষিণের ব্যালকনিতে। যা আমার খুব প্রিয় জায়গা। এ সময় ঘটনাটা আমার চোখে পড়ে। বাসার কাজের মহিলা শাহেরা এসেছিল পাখিটাকে দানা-পানি দিতে। লক্ষ্য করি, পাখিটা তুমুল ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। ট্রি ট্রি ট্রি করে ডেকে, চেঁচিয়ে কী সব যেন বলতে চাইছে শাহেরাকে। আমিও অনেক সময় ওকে দানা-পানি দিই। কিন্তু তখন পাখিটা খুশিতে অতো ডানা ঝাপ্টায় না। ট্রি ট্রি করে অনবরত এমন ডাকাডাকি করতে থাকে না। বিষয়টা লক্ষ্য করে আমি একটু অবাক হই।

শুধু অবাক হওয়া নয়, একটু খারাপও লাগে আমার। পাখিটাকে একদিন ফুটপাতের এক পাখিওয়ালার কাছ থেকে দরদাম করে আমিই কিনে এনেছিলাম। তখন পাখিটা আরো ছোট ছিল। আরো বিষণ্ন ও ভীতু ছিল। আমিই বলতে গেলে খাওয়া-খাদ্য যুগিয়ে ওকে বড় করে তুলেছি। ওকে সুন্দর একটা খাঁচায় রাখার ব্যবস্থাও করেছি। নিজের হাতে পাখিটাকে অনেক সময় আমি দানাপানি দিই। কিন্তু কই, আমি দানা-পানি দিতে গেলে কিংবা আদর করে কথা বলতে গেলে পাখিটা তো ডানা ঝাপ্টিয়ে এবং চেঁচিয়ে অ্যাতো খুশি, এ্যাতো আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না!

একটু খারাপই লাগে আমার। বিষয়টা আরো ভালো করে বুঝার জন্য শাহেরাকে বলি দানা-পানি না দিয়ে চলে যেতে। শাহেরা অনেকদিন থেকে আমাদের সাথে আছে। খুব বিশ্বাসী মহিলা। পাখিটার সাথে আমি একটু মজা করতে চাইছি ভেবে সে একটু হেসে দানা-পানিসুদ্ধ বাটিটা নিয়ে চলে যায়। পাখিটার একটু আগের হাসিখুশি উচ্ছ্বাস যেন আর্তচিৎকারে পরিণত হয়। সে রাগে খাঁচার জালে আঁচড় কাটতে এবং চেঁচাতে থাকে।

একটু পর দানা-পানির বাটিটা নিয়ে আমি যাই টিয়া পাখিটার কাছে। খাঁচার ছোট দরজাটা খুলে পাখিটার পানি রাখার পাত্রে এবং দানাগুলো খাওয়া-খাদ্যির পাত্রে রেখে দিই। পাখিটা যেন এটা দেখেশুনে কিছুটা শান্ত হয়। তবে তার মধ্যে খুশিতে লাফানো সেই উচ্ছ্বাস বা ট্রি ট্রি ট্রি করে হরদম সেই খুশির ডাকাডাকি আর ছিল না। বুঝতে পারি, আমাকে নয়, আমার কেনা টিয়া পাখিটা ভালোবাসে আমার বাসার কাজের মহিলা শাহেরাকে।

একটা ছোট ঘটনা। ভেবে দেখতে গেলে কোনো ঘটনাই নয়। শাহেরা বুয়া সব সময় বাসায় থাকে, তত্ত্বতালাশ বেশি করে, সেজন্যই হয়তো পাখিটা তাকে বেশি চেনে। এতে দুঃখ পাওয়ার কী আছে! কিন্তু যুক্তি যা-ই বলুক, মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেমানুষের মতো বারবার মনে হচ্ছিল, সব জায়গার মতো পাখিটার কাছেও আমি হেরে গেছি।

ব্যর্থ মানুষ অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনায়ও মুষড়ে পড়ে। আমি হয়তো পুরোপুরি ব্যর্থ মানুষ নই। জীবনের কতক কতক দিকে আমার বেশ সাফল্যও আছে। যেমন ব্যাংকে সেই একত্রিশ বছর আগে সাধারণ এক ক্যাশিয়ারের পোস্টে যোগ দিয়েছিলাম। সেখান থেকে উন্নতি করে করে প্রথমে অফিসার এবং পরে তিন তিনটা প্রমোশন পেয়ে প্রিন্সিপ্যাল অফিসার হয়েছি। রিটায়ার করার আগে আমার এজিএম হওয়া বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে চাকরি ও প্রবীণত্বের হিসাবে সেটা আমার পাওনা হয়েছে। এই কর্মজীবন নিশ্চয়ই কোনো ব্যর্থ মানুষের আলেখ্য নয়।

আমার দুই মেয়ে। সুমনা ও রুমানা। তাদেরও আমি মেট্রিক পর্যন্ত পড়িয়ে বেশ ভালো পাত্রে বিয়ে দিতে পেরেছি। সুমনার স্বামী ইয়াকুব থাকে ঈশ্বরদী। সে ভুটান থেকে চালান এনে ফল-মূলের ব্যবসা করে। সুমনার সাথে ঘন ঘন আমি কথা বলতে পারি না কারণ ইয়াকুব নেবে-নেবে করে একটা মোবাইল এখনো নেয়নি, হয়তো এ মাসে কিংবা আগামী মাসে ফোনটা ওরা নিয়ে নেবে। ওরা এখনো ফোন না নিক, ইয়াকুব ব্যবসা যে ভালো শুরু করেছে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমার স্থির বিশ্বাস, আমার একটু কালো তবে বাপের মতো লম্বা এবং মায়ের মতো সুন্দর মিষ্টি চেহারার মেয়েটার উপযুক্ত পাত্রেই বিয়ে হয়েছে।

রুমানার বিয়েটা তো আরো ভালো। সে পেয়েছে তার দাদীর ফর্সা ঘেঁষে শ্যামলা রঙটা, মায়ের মাথার ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল এবং মিষ্টি চেহারাটা। জামানের সাথে তার ভাব হয়েছিল কীভাবে কীভাবে যেন। তখন রুমানা মেট্রিক পাস করে নিউ মার্কেটের কাছে একটা কলেজে পড়ছিল। ভাবটাব আছে জেনে লোক লাগিয়ে জামানের খোঁজখবর নিয়েছিলাম।

পরে আর দেরি করিনি, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। জামানেরও ব্যবসা। তবে ছেলেটা বিয়ের আগে থেকে নিজের ফ্ল্যাটে থাকে। ফোন, ফ্রিজ, টেলিভিশন ইত্যাদি তো ওদের আছেই, মনে হয় আগামী বছরের মধ্যেই হয়তো ওরা গাড়ি কিনে ফেলতে পারে।
এগুলো সাফল্য নয়? আমার তো মনে হয় এগুলো জীবনের বড় সাফল্য বড় জয়। আমাকে তাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ মানুষ কিছুতেই বলা যায় না। বলা উচিত নয়। তবে আমি যে জীবনের এগোনো বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা লোক, তাতেও তো কোনো সন্দেহ নেই। দম দেওয়া একটা পুতুলের মতো আমি অফিস ও বাসা, বাসা ও অফিস- এই ছকের মধ্যে আটকে গেছি। আমাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মানুষ বলা না গেলে সফল মানুষই বা বলা যায় কি না সেটাই আমি মাঝে মাঝে খুব ভাবি। ছক থেকে কিছুতে যে বেরোতে পারলাম না। এই দুঃখও আমাকে খুবই ব্যথিত মথিত করে রাখে।
পাখির ঘটনাটা আমাকে একটু ত্যক্ত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ছোট ঘটনা। বলতে গেলে গ্রাহ্য করার মতো ঘটনাই নয়। তবে হৃদয়কে তো যুক্তি চালায় না। হৃদয়ের যন্ত্রণা, সর্বক্ষণ একটা সুচের আগা সেখানে খুটখুট করতে থাকা, মন খারাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঠেকায় কে? যা হোক, অফিসে যাওয়ার পর ঘটনাটা অনেকটা ভুলেই গেলাম। অন্তত ভোলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। খুব অসুবিধা আর হচ্ছিল না।
শরীরের ম্যাজ ম্যাজ করাটা ছিল। তবু অফিসে বসে থাকলাম ছ'টা পর্যন্ত। ব্যাংকে কাজ করতে চাইলে কাজ অনেকই আছে। কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায় সারাদিন। আমিও সে চেষ্টা করলাম। পাঁচটার দিকে বন্ধু হাসান আহমদ এসে ফাল্গুনীর কথা বলে জমাতে চাইছিল। বলছিল যে ফাল্গুনীর সাথে ফরজ কাজটা সেরে নিলেই হয়। ফাল্গুনীর বসবাস করার জন্য তার নিজের ফ্ল্যাট আছে। আমার মেয়েদের সাথে সে হিসাবে তার কোনো ক্ল্যাশ হওয়ারই আশঙ্কা থাকে না। আমি হাসানকে থামিয়ে দিই একটু হালকা ফাজলামো করে এবং এই বলে যে যৌবনের স্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি আমার আর নেই, কাজেই ফাল্গুনীর বাসা থাকলেই বা তাতে আমার ও তার বিয়ের কি সুবিধা হবে? হাসান আহমদ চা খেয়ে এবং 'দাঁড়া, তোর এই স্ট্যাটাসটা আমি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিচ্ছি' বলে শাসিয়ে একসময় চলে গেল।
হাসান আহমদকে আকারে ইঙ্গিতে এবং অবশ্যই ঠাট্টা করে যা বলেছিলাম তা কি আমার মনের কথা ছিল? আমি কি আসলেই ফুরিয়ে যাওয়া সেরকমের একটা মানুষ? একটু অস্থির ও শঙ্কিত হয়ে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করি। পরে মনে হয়, হাসানকে যতোটা বলেছি, ততোটা হয়তো নই। অথবা হলেই বা কী যায় আসে। আমার বয়স ৫৪ ছাড়িয়ে ৫৫ হচ্ছে তা তো মিথ্যে নয়। এই বয়সটা হচ্ছে না-যুবক না-ফুরিয়ে যাওয়াদের বয়স। সন্দেহ নেই, আমি ফুরিয়ে যেতে থাকাদের দলের। দুঃখ করে লাভ নেই। কারণ তাবৎ মানুষ এভাবে বাঁচে। একদিন এভাবেই ফুরিয়ে আসে।
ঘরে কেউ ছিল না। আমার খানিকটা অস্বস্তি হচ্ছিল। অস্বস্তি নাকি কষ্ট বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে হঠাৎ হঠাৎ যা হচ্ছিল তা খুবই সামান্য। শুঁয়ো-পিঁপড়ের হঠাৎ হঠাৎ কুট করে কামড়ে দেওয়ার মতো।
ভাবতে চেষ্টা করি বুকের ভেতর চাপা এই কষ্ট বা অস্বস্তিটা কেন হচ্ছে? বাসার অবলা এক প্রাণী টিয়া পাখি। সেও যে আমার চেয়ে বেশি দাম দেয় এবং বেশি ভালোবাসে কাজের বুয়াকে- সেজন্যে নাকি? তেমনটা হয়ে থাকলে দোষটা অবশ্য টিয়া পাখি বা কাজের বুয়ার নয়, দোষটা সম্পূর্ণ আমারই। আমারই কাউকে ভালোবেসে জয় করার ক্ষমতা নেই। আবার ভাবলাম একটু আগে হাসানের সাথে বিয়ে, যৌবন, ফাল্গুনী ইত্যাকার না-হক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হল, মন খারাপ হয়ে এই অস্বস্তি বা কষ্টটা কি সেজন্য?
মন মেজাজ ঘোলাটে এবং আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। হঠাৎ কিছু না ভেবে আমি ফোনে তবাস্সুমকে চেষ্টা করতে থাকি। আমি কি মনের তাৎক্ষণিক কষ্ট বা অস্বস্তি থেকে রেহাই পেতে চাইছিলাম অথবা স্বাভাবিক মানুষের হালকা মেজাজে ফিরতে চাইছলাম?
কোনো কিছু না ভেবে, বলা যায় হঠাৎই, অঙ্কের মতো তবাস্সুমকে ফোনে চেষ্টা করতে থাকি। আমি তো ঠিক সময়ে থামতে জানি, সুতরাং আমার ভয় কী? এরকমও ভাবছিলাম আমি ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে। তবাস্সুমকে আমি তেমন ফোন করি না। দু'একবার হয়তো করেছি। তবাস্সুমই আমাকে এখন তখন ফোন করে। কখনো বাসায়। কখনো অফিসে। এরকম চলে আসছে দু'বছর আড়াই বছর ধরে।
ফোন ধরেছিল তবাস্সুমের ভাবী লালা বেগম। যথারীতি সালাম আদাব দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে জানতে চাই তবাস্সুম আছে কি না। লালা বেগম বলে ঃ তবাস্সুম তো নেই...
ঃ কোথায় গেছে?

ঃ একটু বাইরে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও ছিল...
তবাস্সুমকে যেন আমার দরকার। তার ওপর যেন আমার একটা দাবি আছে। খানিকটা অধীর হয়ে এভাবেই কথা বলছিলাম আমি লালা ভাবীর সাথে।
বললাম ঃ যখনই বাসায় ফেরে, আমাকে একটা ফোন করতে বলবেন ভাবী, প্লিজ...
লালা বেগম বলে ঃ বল্ব। তবে...
ঃ তবে কী ভাবী...
ঃ না, মানে, তবাস্সুমের...
বললাম ঃ তবাস্সুমের কি?
লালা ভাবী যেন বলতে পারছিল না। একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়। তারপর বলে ঃ ভাই, আপনি সেদিন আসলেন না কেন?
ঃ কবে?
ঃ তবাস্সুম আপনারে একদিন খুব অনুরোধ কইরা আসতে বলছিল না?
ঃ হ্যাঁ বলছিল। তা আমি তো বলি নাই আপনাদের বাসায় যাব না।
ঃ হ্যাঁ, তা বলেন নাই...
ঃ তাহলে?
আমি এরকম বলে লালা ভাবীর সাথে একটু ঠাট্টা করতে চাইছিলাম। মহিলা আবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়। তারপর বলে ঃ তবাস্সুমের তো বিয়া হয়া গেছে ভাই,...
ঃ বলেন কী!
ঃ হ্যাঁ। আপনারে সে ক্যান জানি খুব পছন্দ করত। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করতে চাইছিল আপনারে। সেজন্যই খুব কইরা অনুরোধ করছিল আপনারে একবার বাসায় আসতে! আপনি তো আসলেন না...
তবাস্সুমের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে আমার তো তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। আমি বেশ খুশির ভাব টেনে এনে লালা ভাবীর সাথে কথা বলতে থাকি। জানা গেল, লোকটা বহু আগে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তবাস্সুম একথা ওকথা বলে দোনোমোনো করছিল। শেষে ভাই ও ভাবী দু'জনই তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তবাস্সুম সম্মতি দেওয়ার চার-পাঁচদিনের মধ্যেই কাজী সাহেবকে বাসায় ডেকে এনে আক্দটা করে ফেলা হয়। তবাস্সুমের স্বামী লোকটা বেশ ভালোই। একটা ডিগ্রি কলেজের বিজ্ঞানের প্রফেসর। বেতন ছাড়াও কোচিং থেকে ভালো কামাই করে। সেও জীবনে দাগা খাওয়া লোক। তার প্রথম স্ত্রী বিয়ের চার বছরের মাথায় দু'বছরের একটা মেয়ে নিয়ে পূর্ব প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল লন্ডনে। এখনো সেখানেই আছে তারা। ডিভোর্সটা অবশ্য বহু আগেই সেরে ফেলা হয়েছিল।
(তিন)
পরের দিন ছুটির দিন, শুক্কুরবার। রাত জেগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে আফ্রিকার এক বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মানুষদের ওপর একটা ছবি দেখেছিলেন। ঘুম থেকে উঠতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে যায় সেলিম হকের। রোজই ভোর-সকালে উঠে হাঁটতে যান সংসদের সামনের রাস্তায়, আজ গেলেন না। ঘুম থেকে ওঠে ভাবছিলেন, তৈরি হয়ে নিয়ে আজ সারাদিনের জন্য কোথাও চলে গেলে কেমন হয়?
ঘরে থাকতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। আবার বাইরে কোথায় যে যাবেন তাও ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। এই দো-টানার মধ্যে থেকে বেশ কিছুক্ষণ কাটালেন সেলিম হক। প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে যথারীতি বসলেন দৈনিক পত্রিকাটা নিয়ে। তার কান অপেক্ষা করছিল ফোন আসার শব্দের জন্য। না, তার কোনো ফোন আসার কথা নেই। তবু অবচেতনে এরকম খুব দূরের একটা অপেক্ষা তৈরি হয়। বলতে গেলে খামোকাই কান সজাগ হয়ে থাকে।
ছুটির দিন। করার কিছু নেই। ব্যালকনির গ্রিল ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সেলিম হক, হঠাৎ তার মনে হয়, টিয়া পাখিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়?
তিনি পাখি যে খুব পছন্দ করেন তা নয়। আবার পাখি বা জীবজন্তু পোষা খুব অপছন্দ করেন তাও নয়। পাখিটা তিনি হঠাৎই একদিন ফুটপাথে বসা পাখিওয়ালার সাথে দরদাম করে কিনে ফেলেছিলেন। দক্ষিণের ব্যালকনিতে পাখিসুদ্ধ খাঁচা ঝুলিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেন, মন্দ কী, পাখিটা এভাবেই বেঁচে থাকুক। কিছু কিছু মানুষও তো তাদের স্বেচ্ছাবন্দিত্ব নিয়ে

এভাবেই বেঁচে থাকে।
তারপর থেকে পাখিটা আছে। বেশ ভালোই আছে বলতে গেলে। দানা-পানি খায়। খাঁচার দাঁড়ে বসে ঝিমোয়। কখনো বা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে খাঁচার ভেতরেই ডানা ঝাপ্টাতে থাকে। হয়তো নীল শূন্যে ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার তৃষ্ণা মাঝে মাঝে তাকে আকুল করে তোলে। তবে নীল আকাশে উড়ে বেড়ানোর স্বাধীনতা যে আর কোনোদিন মিলবে না, তাও যেন পাখিটা বুঝে ফেলেছে। দিব্যি সে তার খাঁচার জীবনের সাথে আপোস করে নিয়েছে। বলতে গেলে খাঁচার ভেতর ভালোই আছে সে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফুলিয়ে চোখ গুলিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, মাঝে মাঝে ট্রি ট্রি করে ডাকে।
সেলিম হক ভাবেন পাখিটা খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? তবাস্‌সুমও বলত চিড়িয়াটা আটকে রেখেছেন কেন? তার এবং তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার প্রতি খানিকটা সম্মান দেখানো যাক- ভেবে সেলিম হক সত্যি সত্যি খাঁচার দরজাটা খুলে দেন। টিয়া পাখিটা তক্ষুনি লাফাতে লাফাতে বাইরে চলে আসে। কিছুক্ষণ বসে ব্যালকনির গ্রিলের ওপর। একটু যেন অবিশ্বাসের চোখে তাকায় ও সেলিম হকের দিকে। তারপর যা হওয়ার কথা, ডানা ভাসিয়ে আকাশে উড়াল দিল।
সেলিম হকের বেশ লাগে দৃশ্যটা দেখতে। তার মনে হয় অনেক আগেই পাখিটা খাঁচা খুলে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। অথবা খাঁচায় পুরে পাখি পোষার এই কাজটাই হয়তো করা উচিত ছিল না তার। তিনি তাকিয়ে দ্যাখেন পাখিটা আকাশে উড়ছে। শূন্যের নীল পান করে যেন মাতাল হয়ে উঠছে তার ছোট দেহটি। থেকে থেকে দুলছিল সে।
দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার পত্রিকা পড়া শেষে আবার একবার, এমনিই, উদ্দেশ্যহীনভাবে দক্ষিণের ব্যালকনিতে এসেছিলেন সেলিম হক। এসে দ্যাখেন, আশ্চর্য, পাখিটা ফিরে এসেছে। বসে আছে তার পুরোনো খাঁচাটার ওপর। সেলিম হক শব্দ করে, হাততালি বাজিয়ে পাখিটাকে আবার শূন্যে ওড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ইতস্তত করছিল। সে যেন যেতে চাইছে না।

Courtesy : Bhorer Kagoj